রক্তাভ গৌর। সুবক্র ঠোঁট দুটি দেখলে মনে হয় তাতে রঞ্জনী দেওয়া রয়েছে। কিন্তু বিশাখা কোনও রঞ্জকদ্রব্য ব্যবহার করেনি। তার কান, নাক, কপাল, বিশাল দুই পক্ষ্মাচ্ছাদিত চক্ষু, চিবুক থেকে আরম্ভ করে বাহুযুগল, আঙুলগুলি সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অশেষ যত্নে গড়া।'[২] এই নারীর প্রণয়ী তক্ষশীলিত তিষ্য ভদ্রের মনে হয়েছে, 'বিশাখা অন্য রকম, তার সৌন্দর্যের সঙ্গে লাবণ্য, গাম্ভীর্যের সঙ্গে চাপল্য, বুদ্ধির সঙ্গে সারল্য, আভিজাত্যের সঙ্গে করুণা এমন আশ্চর্যভাবে মিশেছে।'[৩]

শ্রাবস্তীবাসী মৃগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র তরুণ পুণ্যবর্ধনের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয় বিশাখা। বিবাহের পর একান্ত নির্জন সাক্ষাতে স্বামী পুণ্যবর্ধন যখন তাকে বলে, 'তুমি তো বালিকামাত্র, কামকলার কী-ই বা তুমি জানো? নির্জন ভোগের স্বাদ একপ্রকার, আবার সখাদের নিয়ে একত্রে ভোগের স্বাদ অন্যপ্রকার।'[৪] তখন লম্পট, কামলোলুপ স্বামীর প্রতি ঘৃণায়, ক্ষোভে, হতাশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে বিশাখা। পুণ্যবর্ধন তাকে কাহ্না নামের এক রমণীর গল্প শোনায়। যে পাঁচজন রূপবান, গুণবান, বীর্যবান পতি থাকা সত্ত্বেও তার এক কুব্জ পরিচারকের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পতিদের প্রবঞ্চনা করে। পুণ্যবর্ধন বলে যে, রমণীরা সুযোগ পেলেই স্বামীর সখা, সূত, দাস, এমনকী ভ্রাতা বা পিতার সঙ্গেও নানাবিধ অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হতে দ্বিধা করে না। স্বামীর নারীদের সম্পর্কে এরূপ কুৎসিত মনোভাবের পরিচয় পেয়ে অটল মহিমান্বিতা বিশাখা বলেছে, 'নারীদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা যে পোষণ করে সে আমার দাসীদেরও যোগ্য নয়।'[৫] পঞ্চাদশী বিশাখা প্রবল ব্যক্তিত্ব সহকারে স্বামীকে বলেছে 'সামান্য নারী বিশাখা নয়। কিন্তু তুমি অতি অধমেরও অধম পুরুষ। তোমার লজ্জা নেই তাই অগণিত গণিকাগৃহে গিয়ে গিয়ে নিজের কৌমার নষ্ট করেছ। অন্যান্য সঙ্গীদেরও তাই করতে দেখেছ। তারও পরে তোমার নারী-নিন্দা করবার সাহস হয়! প্রভু! স্বামী! এ পৃথিবীতে বিশাখার প্রভু কেউ নেই। আর বিবাহিত স্বামী বলে যদি নিজেকে বিশাখার প্রভু বলতে চাও, বলতে পারো। কিন্তু বিশাখা কোনওদিন তোমার মতো হীন ব্যক্তিকে প্রকৃত স্বামী বলে স্বীকার করবে না।'[৬]

স্বামীর কামনার হাত থেকে রেহাই পেতে, পুণ্যবর্ধনের ওপর শারীরিক বলপ্রয়োগ ঘটাতেও দ্বিধা করেনি বিশাখা। বিস্মিত, হতবুদ্ধি স্বামীকে নিজের তেজস্বিতার পরিচয় দেয় বিশাখা। 'সেদিন শ্বশ্রূ-মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন কোনও দুর্বৃত্ত তোমাকে আক্রমণ করলে কী করবে? আমি তাঁকে আশ্বস্ত করেছিলাম এই বলে যে, দশজন পুরুষকে ধরাশায়ী করাও আমার কাছে কিছু না। তখন ভাবিনি আমার বিবাহিত পুরুষই হবে প্রথমত দুর্বৃত্ত, যাকে আমায় ধরাশায়ী করতে হবে। শোনো পুন্নবদ্ধন, ঋদ্ধিও নয়, জাদুবিদ্যাও নয়, আমার পিতা-মাতা আমাকে মল্লবিদ্যা, শরসন্ধান, ভারোত্তোলন সব শিখিয়েছেন। তা তোমারই ওপর প্রথম প্রয়োগ করতে হল। ধিক, ধিক তোমাকে।'[৭]

চরম ঘৃণাভরে স্বামীকে বহিষ্কার করে, তিরস্কার করে, প্রত্যাখ্যান করে চলে গেছে বিশাখা। অপমানিত, লাঞ্ছিত পুণ্যবর্ধন ঘর ছেড়েছে। তিন বছর গৃহ থেকে দূরে অবস্থান করে বাণিজ্যকর্ম শিক্ষা করে, প্রভূত ধন উপার্জন করেছে সে। গণিকাগৃহে যাওয়া থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করেছে। বিশাখার যোগ্য করে তুলেছে নিজেকে। আর তারপর নতজানু হয়ে স্ত্রী বিশাখার কাছে প্রণয়ভিক্ষা করেছে। এবার বিশাখা

পুণ্যবর্ধনকে ফেরায়নি। স্বামীর আলিঙ্গনে সমর্পণ করেছে নিজেকে।

'অষ্টম গর্ভ' উপন্যাসে দেশভাগ পূর্ববর্তী সময়কালের কলকাতার একটি পরিবারের কথা বলা হয়েছে। এই উপন্যাসের এক বিশিষ্ট চরিত্র মনোমোহিনী দেবী। উপন্যাস কথক এই চরিত্র সম্পর্কে বলেন, 'ঠাকুমা একই সঙ্গে খুব দুর্বল এবং খুব সবল ছিলেন। দুটোরই উৎস বোধহয় তাঁর সততা ও বিবেক। লম্বা, ময়লা রং, একটু ঝুঁকে পড়া ঠাকুমা দেখতে সুন্দর ছিলেন না। কিন্তু হাসলেই মুখটা অদ্ভুত সুন্দর হয়ে যেত।'[৮]

মনোমোহিনী ছিলেন স্বামী শিবপ্রসাদ সিংহরায় এর তৃতীয় পক্ষ। বুদ্ধিমতী এই মানুষটি বুঝেছিলেন, '...তথাকথিত রূপের অভাবে তাঁর সব সঞ্চয়ই অচল পয়সা হয়ে গেল। বয়স্ক স্বামী, দুই স্ত্রীতে অভিজ্ঞ, রীতিমতো কামুক। একটি ছোট বোনের মতো সাবালিকা কন্যা যে ইতিমধ্যেই জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে গেছে। একটি নাবালক পুত্র যার পুরোপুরি ভার তাঁকে দিয়েও দেওয়া হবে না।'[৯] এ যেন অধিকারবিহীন দায়িত্ব, এমতাবস্থায় সংসারের অধিকার স্বেচ্ছায় বিধবা সতীনকন্যার হাতে তুলে দিয়ে সরে দাঁড়ান, সে যুগে বেথুন থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে উনিশ বছরে সংসার করতে আসা মনোমোহিনী।

নিঃসন্দেহে মনোমোহিনী ছিলেন একজন বিদ্রোহিণী, 'বিদ্রোহী কিন্তু কোনও কিছু অস্বীকার করার বিদ্রোহ সে নয়। পরিচিত সম্পর্ককে নতুন মাত্রা দিতে দিতে তিনি নিজের তৈরি জগতে বেঁচে থাকতেন।'[১০] সংসারের কেন্দ্রস্থল থেকে সরে গিয়ে মনোমোহিনী সাহিত্যরসে নিমজ্জিত হন, 'তিনি ঘুরে বেড়াতেন এক দ্বিতীয় পৃথিবীতে, তৃতীয় সংসারে, চতুর্থ লোকে যেখানে তিনি সুচরিতা হয়ে গোরার প্রেমে পড়ছেন, অথবা রাজলক্ষ্মী হয়ে শ্রীকান্তর, সাবিত্রী হয়ে যেখানে তিনি মুখে কাপড় গুঁজিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িতেছেন, সূর্যমুখী হইয়া একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছেন,...।'[১১] এভাবেই মানুষটি ভালো থাকার বিকল্প উপায় খুঁজে নেন, নিজস্ব এক টুকরো জগত তৈরি করে নেন। স্বামীর যাবতীয় কর্তব্যকর্ম সম্পাদন সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কিছুটা ব্যবধান বা দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন মনোমোহিনী, যা শিবপ্রসাদ কখনো অতিক্রম করে উঠতে পারতেন না, স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্কার করা ছিল তাঁর অসাধ্য। বিয়ের পরই বিধবা সতীনকন্যার দুঃখে সমব্যথী হয়ে মাছ খাওয়া ও রঙিন শাড়ি পরা ত্যাগ করা, সতীন পুত্র-কন্যাদের কথা ভেবে সন্তানধারণে অসম্মত, ব্যতিক্রমী স্বভাবের স্ত্রীকে বোধহয় আলাদাভাবে চিনতে পারেন শিবপ্রসাদ। তাই তো সন্ধ্যেবেলা রুগী দেখে বাড়ি ফেরার পথে মনোমোহিনীর জন্য তিনি সংগ্রহ করে আনতেন গল্পের বই। তাঁর মনের খোরাক এবং মনোমোহিনীর ব্যক্তিত্বের জোরেই হয়ত শেষপর্যন্ত শিবপ্রসাদ তাঁকে শুধু 'মেয়েমানুষ' না, 'মানুষ' হিসাবে ভাবতে পারেন। ব্যক্তিত্বময়ী মনোমোহিনী তাঁর সুদর্শন, গুণবান স্বামীর কাছ থেকে '...মৃত্যুর আগে রোমান্টিক প্রেম আদায় করে নিতে পেরেছিলেন।'[১২]

'গান্ধর্বী' উপন্যাসে অপালার জীবন-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। অপালার পরিচয় ঔপন্যাসিক দিয়েছেন এভাবে, 'অপালা খুব শান্ত ধীর স্বভাবের মেয়ে। বেশি কথা বলে না। মনের কথাও চট করে বলতে পারে না। দু-চোখ শুধু ভারী হয়ে যায় দুঃখ হলে। আনন্দে গাল চকচক করতে থাকে।'[১৩] সহজ সরল মেয়েটিকে বোঝাতে সহজ গদ্যের

প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। তবে 'তানপুরো হাতে নিলেই অপালা মিত্র আর মনুষ্যলোকে থাকে না।'[১৪] গান তার জীবনের ধ্রুবতারা, আর তাই রামেশ্বর ঠাকুরের শিষ্যা, ইস্টার্ন রিজিওনের ট্যালেন্ট সার্চ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী অপালা তার হবু স্বামীকে অপকটে বলে, 'আসলে আমি গান ছাড়া আর কিছুই তেমন করে মানে ভালবাসতে পারি না।'[১৫] তার কাছে জীবনের অর্থ হল, '...ভৈঁরো থেকে ললিত, ললিত থেকে রামকেলী, রামকেলী থেকে পরজ, পরজ থেকে আলাহিয়া বিলাবল...'[১৬]। বিয়ের পর দিস্তে দিস্তে রুটি বেলা, সন্ধ্যাবেলা শাঁখে ফুঁ দেওয়া, মটরশুঁটির কচুরি তৈরিতে ব্যস্ত অপালার আর নিয়মিত গানের রেওয়াজ করা হয়ে ওঠে না। গানের মাস্টার রামেশ্বর ঠাকুরের মনে হয়, '...তিনি সেই ক্রমাগত ঊর্ধ্বারোহী, সতেজ তরুনটিকে পাচ্ছেন না, এ যেন এক নতশাখ বৃক্ষ। জলের অভাবে, সূর্যালোকের অভাবে বিবর্ণ, ক্লান্ত, হতশ্বাস।'[১৭]

পারিবারিক অসহযোগিতা সত্ত্বেও অপালা রেওয়াজ পুরোপুরি বন্ধ করেনি। বাড়ির নীচের তলার বসার ঘরে গানের ইস্কুল খোলা, শম্পা মিত্র নামক সেতারী এবং বীণাবাদিনীর কাছে তালিম নেওয়া, দূরদর্শনে গান রেকর্ডিং, ছায়াছবিতে কণ্ঠদান, গুরুভ্রাতা সোহমের সঙ্গে মঞ্চে যুগলবন্দী পরিবেশন অপালার প্রতিবাদী সত্তাকে চিনিয়ে দেয়। এই অপালাই রাতের পর রাত স্বামীর অত্যাচার নীরবে সহ্য করতে করতে একদিন সোচ্চার হয়েছে। বলেছে, 'তোমাকে আমি চিরকাল ফিরিয়ে দিতে চেয়েছি। পারিনি আমি ভদ্র বলে। তোমাকে আঘাত করতে আমার কষ্ট হয় বলে। প্রতিবাদ আমার আসে না বলে। ...তুমি প্রত্যেকবার আমাকে নির্মমভাবে রেপ করো। আমি ছাড়া আর অন্য কোনও মেয়ে এ জিনিস বছরের পর বছর সহ্য করত না। তুমি হয় ভালবাস না, নিষ্ঠুর স্বভাবের মানুষ, তোমার ভদ্র শান্ত মুখোশটা শুধু খুলে যায় আমার কাছে, যাকে তুমি চিরকাল বোকা, সরল, নিরীহ বলে উপেক্ষা করে এসেছ, আর নয়তো তুমি...তুমি ভালবাসতে শেখোনি।'[১৮]

'ভালোমানুষ' অপালার প্রতিবাদ স্তম্ভিত করে দেয় স্বামী শিবনাথকে। অপালার কাছে যে ভালোবাসা '...ঠুংরির মোচড়ের মতো, গজলের পুকারের মতো, সেতারের তরফের তারগুলোর ঝিনিঝিনি আওয়াজের মতো'[১৯], তার সন্ধান একদিন শিবনাথ পেয়েছে। যখন অপালার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন তার মাথার হাত রেখে পরম স্নেহভরে শিবনাথ আশ্বাস প্রদান করেছে, 'অপু তোমার গলা আবার ঠিক হয়ে যাবে, ফিরে আসবে, তুমি আবার গাইতে পারবে। কেন এমন করছ? ... আমরা আছি তো!'[২০] সত্যিই শিবনাথ শেষপর্যন্ত ছিল। অসুস্থ অপালাকে সুস্থ করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় সে। স্বরভঙ্গজনিত বেদনায় আক্রান্ত স্ত্রীকে তার পরম কাঙ্ক্ষিত ভালবাসার সন্ধান দেয় শিবনাথ, 'রাত্রে এক আকাশ নীল বুকে নিয়ে ছাতের ঘরে দুজনে শুয়ে থাকে। শিবনাথ সন্তর্পণে, খুব নরম আঙুলে তার সারা মুখে মাথায়, শরীরে হাত বুলিয়ে দ্যান, অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে অপালা, কিন্তু শিবনাথ নিঘুম।'[২১] সে ভাবতে থাকে অপালার রোগমুক্তির উপায়। শেষপর্যন্ত শিবনাথ সত্যিই অপালাকে তার চোখ দিয়ে দেখতে পেরেছিল। তাকে গোটা-টা বুঝতে পেরেছিল। নিজের দুর্বলতা, অসুস্থতাকে কাটিয়ে উঠে অপালায় যথার্থ সঙ্গী হওয়ার চেষ্টা করেছিল।

তিন চরিত্র বিশাখা, মনোমোহিনী, অপালা তিনটি ভিন্ন সমাজব্যবস্থায় অবস্থান করেছে। তবু তারা কোথাও যেন একরকম। দাম্পত্যজীবনে একই নীতি অবলম্বন করেছে তারা। এই তিন নারীর দাম্পত্যজীবন সুখৈশ্বর্যে পরিপূর্ণ নয়, বরং প্রতিকূল। এই প্রতিকূলতা, তথা প্রতিবন্ধকতাকে তারা জয় করেছে আপন সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা। সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে বা তাকে অস্বীকার করে নয়, বরং দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে থেকেই নিজ নিজ গুণের প্রকাশ ঘটিয়েছে তারা। বিশাখার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছে তার রূপ ঐশ্বর্য এবং বুদ্ধিমত্তার সমন্বয়ে। এই ব্যক্তিত্বের জোরেই একদিন সে হয়ে উঠেছে গোটা পরিবারের চালক, পালক, রক্ষয়িত্রী। মনোমোহিনী সহজাত বুদ্ধিবলে সাংসারিক ক্ষমতা দখলের লড়াই থেকে সরে এসেছেন। তবু শিক্ষা, রুচি ও আপন প্রতিভাবলে আধুনিকা এই নারী স্বামীর মনে বিশেষ জায়গা করে নিতে পেরেছেন। অপালা মিত্র লাজুক, নম্র, মধ্যবিত্ততা সম্বলিত একটি মেয়ে। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত সে নয়। রূপের জৌলুষ বা অর্থের গরিমাও তার নেই। তবু মাটির দিকে তাকিয়ে পথা চলা, মাটির মতো নরম এবং সর্বংসহা কিন্নরকণ্ঠী এই মেয়েটি প্রয়োজনে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারে। পরিবার-পরিজনের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানকারী অপালা কিছুতেই তার শিল্পীসত্তার মৃত্যু ঘটতে দেয়নি।

'মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা' গ্রন্থে আধুনিক যুগের নারী ঔপন্যাসিকদের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সুদক্ষিণা ঘোষ বলেছেন, 'সমাজের গড়ে দেওয়া আদর্শে নয়, এই প্রেমে-অপ্রেমে দ্বন্দ্ব-মধুর সম্পর্কটির কষ্টিপাথরে যাচাই করে তাঁরা বুঝে নিতে চেয়েছেন নারীর আপন মূল্যটুকু। তাঁদের উপন্যাসেও প্রেম এসেছে, এসেছে বিবাহিত জীবনের কখনো মধুর, কখনো কষার স্বাদ, দাম্পত্য অধিকারবোধের যন্ত্রণা ধরা পড়েছে, কিন্তু কখনোই মেয়েদের স্বতন্ত্র সত্তাকে বিসর্জন দিতে হয় নি। পুরুষের প্রেমকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করে নি এইসব উপন্যাসের মেয়েরা, কিন্তু সেই অনিশ্চিত বৃন্ত যার ওপর ভর করেই মেয়েদের ফুটে ওঠা বা ঝরে যাওয়া এই ভাবনায় নিজেদের বেঁধে রাখে নি তারা।'[২২] এই একই কথা বাণী বসুর সাহিত্য সম্পর্কেও বলা যায়। বিশাখা, মনোমোহিনী, অপালার অবলম্বন প্রত্যক্ষত কোনো পুরুষ নয়, নিজের ভালোলাগাকে ভালোবাসাকে মর্যাদা দিতেই তাদের পথ চলা। তবু নিজের মধ্যেকার সম্ভাবনার বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি, সমাজ-সংসারের বন্ধনকে, দাম্পত্য সম্পর্ককেও গুরুত্ব দিয়েছে তারা। সে সম্পর্কের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছে। 'স্বামী'-র থেকে নিজ কর্মগুণে আদায় করে নিয়েছে স্বীকৃতি। জয় করেছে পুরুষ হৃদয়। এভাবে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার ফলেই তারা হয়ে উঠেছে যথার্থ অর্থে পরিণীতা, সম্পূর্ণা।

তথ্যসূত্র

১। বসু বাণী, মৈত্রেয় জাতক, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৭ নভেম্বর। (সপ্তম মুদ্রণ), পৃ. ২২।
২। ঐ, পৃ. ২৪।
৩। ঐ, পৃ. ২৯।
৪। ঐ, পৃ. ১৫৬।
৫। ঐ, পৃ. ১৬৩।

৬। ঐ, পৃ. ১৬৩।
৭। ঐ, পৃ. ১৬৪।
৮। বসু বাণী, অষ্টম গর্ভ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৫ এপ্রিল (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৫৭।
৯। ঐ, পৃ. ৬১-৬২।
১০। ঐ, পৃ. ৬১।
১১। ঐ, পৃ. ৬২।
১২। ঐ, পৃ. ৬১।
১৩। বসু বাণী, গান্ধর্বী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৩ ডিসেম্বর (সপ্তম মুদ্রণ), পৃ. ৩৩।
১৪। ঐ, পৃ. ২৪।
১৫। ঐ, পৃ. ৫০।
১৬। ঐ, পৃ. ৫২।
১৭। ঐ, পৃ. ৮৮।
১৮। ঐ, পৃ. ১৬৮।
১৯। ঐ, পৃ. ১৬৯।
২০। ঐ, পৃ. ১৮৫।
২১। ঐ, পৃ. ১৭৯।
২২। ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮ জানুয়ারি (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১৪৪-১৪৫।

Shreeta Mukherjee, University of Delhi

বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমস্যা

তন্ময় কুণ্ডু

'বাঁকাউল্লারদপ্তর'-কে বাদ দিলে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়-এর 'দারোগার দপ্তর' দিয়ে বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্যের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, তা আজও বহমান। ১০০ বছরের বেশি সময় ধরে প্রবহমান এই সাহিত্য ধারার উদ্ভব, বিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক মূল্য নিয়ে বছর খানেক আগে গবেষণা শুরু করেছিলাম দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ'-এ। ফলে গবেষণার প্রাথমিক নিয়ম মেনে প্রথমেই গোয়েন্দা কাহিনির বই কিনতে ছুটলাম কলকাতায়। আর এই বই কেনা ও কেনার পরে যে সমস্যার সম্মুখীন হলাম তারই লিখিত রূপ আমার এই প্রবন্ধটি। ফলে এই প্রবন্ধে আমি কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছি পাঠকদের সামনে আর চেষ্টা করেছি তার কিছ সম্ভাব্য সমাধান সূত্র নির্দেশ করতে।

মূল বক্তব্যে আসার আগে প্রথমেই মনে পড়ে গেল রবীন্দ্রনাথ-এর একটি কবিতার চরণ—"আকাশে চুলের গন্ধটি দিওপাতি।" সে সময় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি এর সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, চুল কি মাদুর যে পেতে দিতে হবে এই ঘটনাটি উল্লেখ করার কারণ হল সে— কালে সুরেশচন্দ্র সমাজপতি-র মতো ব্যক্তিদের মতকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হতো তবে হয়তো আজ রবীন্দ্র-কবিতা আমাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতো না। এই একই ধরনের উন্নাসিকতার বশবর্তী হয়ে একদল লোক দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্য 'High Literature' ও Low Literature' -কে আলোচনা বা গবেষণার অযোগ্য বিষয় বলে চিহ্নিত করে এসেছেন। তবে আনন্দের বিষয় যে, দীর্ঘ তর্ক-বিতর্ক ও আন্দোলনের পরে বর্তমানে এই ভেদ অনেকাংশে দূর হয়েছে, এই সংকীর্ণ মানসিকতার অনেকটাই পরিবর্তন করা গেছে। তাই তো আজ একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে তথাকথিত 'Popular Literature' বা 'জনপ্রিয় সাহিত্য' পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বা হতে চলেছে। তবে সেই সংকীর্ণ চিন্তাধারা যে সম্পূর্ণরূপে দূর করা যায় নি, যখন দেখা যায় যে, তথাকথিত 'Popular Literature'—কে মূল সাহিত্যধারার মধ্যে স্থান না দিয়ে তাকে একটি বিশেষ পত্র হিসাবে আলাদা রাখা হয়। আর এজন্যেই হয়তো যেখানে নামী-দামী সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম, তার পাণ্ডুলিপি ও সাহিত্যিকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সমালোচক-গবেষকদের মাতামাতি লক্ষ্য করা যায় সেখানে অবহেলিত হয় গোয়েন্দা সাহিত্য, ভৌতিক বা অতিপ্রাকৃতিক গল্প, অভিযানমূলক কাহিনি, হাসির গল্পের মতো সাহিত্যকর্ম, অন্ধকারে পড়ে থাকে এই সব সাহিত্য স্রষ্টারা। ফলে ক্রমশই তাঁরা এগিয়ে চলে অবলুপ্তির কালগহ্বরে।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু 'বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : সম্পাদিত ও প্রকাশনা

কুণ্ডু, তন্ময় : বাংলা গোয়েন্দা সাহিত্য : সম্পাদনা ও প্রকাশনা সমস্যা
International Journal of Bengal Studies, Vol. : 2-3, 2011-2012, PP 147-158